বাংলা নাটকে মুসলিম সমাজ

কর্ণফুলী প্রতিবেদন

বাংলা নাটকে মুসলমান সমাজ বিষয়ক গ্রন্থ খুব একটা প্রতুল নয়। ড. ঊষাপতি বিশ্বাসের 'মুসলমান সমাজ ও বাংলা নাটক' (১৮৫২-১৯৫০) (কলকাতা বইমেলা-২০০৪) গ্রন্থটি তার পিএইচডি অভিসন্দর্ভের গ্রন্থরূপ বলেই শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং ৩১ জন হিন্দু নাট্যকারের নাটক অনুসন্ধান করে এবং ৯ জন মুসলিম নাট্যকারের নাটকের বিষয় বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে তিনি যে মুসলমান সমাজের চিত্র সেখান থেকে উদ্‌ঘাটন করেছেন, সেই বিষয়গুণেই গ্রন্থটি তাৎপর্যের দাবি রাখে। অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক যে উন্নত দৃষ্টিভঙ্গিতে গবেষক তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন, তাতেও তাঁর রুচি, বোধ এবং নিরীক্ষণের উৎকর্ষই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

গবেষণা গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে গবেষক ড. ঊষাপতি বিশ্বাসকে সর্বক্ষেত্রে যিনি সর্বাধিক সহায়তা করেছেন তিনি হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থটির ভূমিকায় ড. মুখোপাধ্যায় ড. বিশ্বাসের কাজে সপ্রশংস হয়েছেন, কারণ, এ গ্রন্থ রচনায় নির্দিষ্ট কোন গ্রন্থাবলী থেকে তিনি সাহায্য পাননি। ড. মুখোপাধ্যায়ের এ কথা সত্য। সচেতনজন জ্ঞাত আছেন যে, গোলাম মুরশিদের 'সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক' গ্রন্থে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেরই সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচিত হয়েছে, বিশেষ করে হিন্দু সমাজের। জয়ন্ত গোস্বামীর 'সমাজচিত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন' গ্রন্থেও মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের সমাজচিত্র চিত্রিত হয়েছে ব্যাপকভাবে। কবিতার ক্ষেত্রে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের 'আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক' এবং উপন্যাসের ক্ষেত্রে রশীদ আল ফারুকীর 'বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান' শীর্ষক গ্রন্থ রচিত হলেও নাটকের ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমান সমাজকেন্দ্রিক নাট্যগবেষণা ড. ঊষাপতি বিশ্বাস ব্যতীত অন্য কোন গবেষকের কাজ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। এ গবেষণা ব্যাপদেশে গবেষক ১৮৫২ থেকে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ অবধি প্রায় শতবর্ষের প্রায় শতাধিক মূল নাটক অনুসন্ধান করে বাংলা নাটকের মধ্যে মুসলমান সমাজের প্রতিফলনকে শ্রমসাধ্য সার্থকতায় তুলে এনেছেন।

বাংলা সাহিত্যালোচনায় বিশেষ করে নাট্যালোচনায় আমরা দেখেছি ১৮৫২ থেকে ১৮৭৬ সন পর্যন্ত রচিত নাট্যাবলীর মধ্যে মুসলমান সমাজ অপেক্ষা রাষ্ট্রনৈতিক দ্বন্দ্বের কথাই সেখানে বেশি অভিব্যক্ত হয়েছে। ইংরেজ শাসন প্রারম্ভের সে প্রথম শতবর্ষে শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজ যে পশ্চাৎপদ ছিল-তা আমাদের অজ্ঞাত নয়। সেজন্য সে সময় পর্বের নাটকে হিন্দু নাট্যকারগণ কর্তৃক মুসলিম বৈরিতার ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। উনিশ শতকের শেষ পর্বে মুসলিম লেখক-নাট্যকারদের পদচারণায় বাংলা সাহিত্য যখন মুখরিত হচ্ছিল নতুনতর অভিক্ষেপে, তখনকার নাট্য রচনাসমূহে সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে নাট্যকারদের ঐক্যভাবনাতেই মুসলমান সমাজ চিত্রিত হয়েছে। বিশ শতকের প্রারম্ভে মুসলমান সমাজ একটি স্পষ্টতা নিয়ে দাঁড়াতে শুরু করেছিল এবং ১৯২০ পরবর্তী সময়ে তাদের সামাজিক ও বিভিন্ন আঙ্গিকগত সাহিত্যিক অবস্থান আরো অধিকতর স্পষ্টতা পেতে শুরু করে।

'মুসলমান সমাজ ও বাংলা নাটক' (১৮৫২-১৯৫০) গ্রন্থটিতে চল্লিশজন নাট্যকারের মধ্যে ৩১ জন হিন্দু এবং ৯ জন মুসলমান নাট্যকার। আলোচিত প্রায় শতাধিক নাটকে মুসলমান চরিত্রের সংখ্যা সহস্রাধিক। ৩১ জন হিন্দু নাট্যকারদের যে সমস্ত নাটকে মুসলমান চরিত্র ও মুসলিম সমাজ চিত্রায়ন রয়েছে, সেসব নাটকসমূহ গবেষক সংক্ষিপ্তভাবে অথচ লক্ষ্যভেদীভাবে আলোচনা করেছেন।

তবে অনেকক্ষেত্রেই তিনি নাট্য-কাহিনী এবং চরিত্রভিত্তিক বর্ণনার মাধ্যমেই তাঁর বক্তব্য ব্যক্ত করেছেন। তাঁর আলোচিত প্রায় নাটকেই লক্ষ্য করা গেছে যে, ইসলামী শরীয়তি ভাবনাসম্পৃক্ত অনেক প্রসঙ্গকে তিনি নাট্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতেই তুলে এনেছেন, তবে সেগুলোর সামাজিক উপযোগিতা নাট্য রচনার সময়পর্বে এবং পরবর্তীকালে কিভাবে বিবর্তিত হয়ে সমাজ কাঠামোকে আত্মীকৃত, সংশোধিত, বিবর্ণিত, পরিশ্রুত অথবা বর্জিত হয়েছে-তার কোন সমাজতাত্ত্বিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তিনি তাঁর অভিসন্ধর্ভে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করেননি। গবেষক লিখেছেন যে, বিভিন্নভাবে মুসলমান চরিত্র, ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি, জীবনাদর্শ, শাস্ত্রনির্ভর জীবনচর্যা, নারী সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, পারস্পরিক সম্বন্ধ, অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি মনোভাব বাংলা নাটকে এসেছে। কিন্তু তিনি তাঁর নাট্যালোচনার ক্ষেত্রে সমাজ অবয়বের বাহ্য গঠনের অনুষঙ্গগুলোর প্রতিই অধিকতর মনোযোগ নিবন্ধ করেছেন। সমাজ কাঠামোর অন্তর্গত দোলাচল ও বিবর্তনকে তিনি তীক্ষ্নদৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেননি। হয়ত মুসলমান সমাজের বহুরৈখিক জীবনবাস্তবতা সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষাভিজ্ঞতার উনতা সেজন্যও দায়ী থাকতে পারে। তবে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত একজন গবেষক হয়ে, তিনি যেভাবে অসাম্প্রদায়িক, উদার ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর সমস্ত আলোচনা, বিশেস্নষণ ও মূল্যায়নকে উপস্থাপিত করেছেন, তাতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে উচ্চতাই প্রমাণিত হয়েছে। মুসলমান সমাজ নিয়ে কাজ করার তাঁর এ আগ্রহের মধ্যেও তাঁর উদার প্রজ্ঞাদৃষ্টি বিচ্ছুরিত। ড. অমলেন্দু দে'র 'বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ' এবং সুরজিৎ দাশগুপ্তের 'ভারতবর্ষ ও ইসলাম' গ্রন্থদ্বয়ে তাঁরা অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েও মুসলমান সমাজকে যেভাবে অসাম্প্রদায়িক মানবিক দৃষ্টিতে ব্যবচ্ছেদ করেছেন, নাট্যালোচনার ড়োত্রে ড. উষাপতি বিশ্বাস দৃষ্টিভঙ্গিগত ক্ষেত্রে ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছেন বলেই আমি মনে করি। তবে নাট্য বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের বহিরঙ্গ চিত্রায়ন ও মূল্যায়নের সমান্তরালে তাদের অন্তর্জীবনের কাঠামোও বিশ্লেষিত থাকলে গ্রন্থটি অধিকতর ঋদ্ধ হতো বলে আমি মনে করি।

গবেষকের 'বাঙালী মুসলমানের কালানুক্রমিক পটভূমি' শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে বাঙালি মুসলমানের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেড়িগতের বিবর্তন প্রেড়াপট সংক্ষিপ্ত অথচ তীক্ষ্নভাবে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। মুসলমান সমাজে মৌলিক ভাবনার মানুষ খুব বেশি না জন্মানোর কারণ হিসেবে গবেষক এ সমাজের সামাজিক লক্ষ্যের দ্বি কিংবা ত্রিমুখীতাকে দায়ী করেছেন। কিন্তু সে দ্বি ও ত্রিমুখিনতার কোন ব্যাখ্যা তিনি প্রদান করেননি। আসলে শিক্ষার্জনে মুসলমানদের পশ্চাদপদতা এবং সংস্কারমুক্ত প্রাজ্ঞ ও মুক্তদৃষ্টির অভাবেই এ সমাজ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে তত উত্থিত হতে পারেনি।

মুসলমান সমাজের লোকজন শিক্ষাদীক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজ থেকে শতবর্ষ পিছিয়ে থাকার কারণে তাদের মধ্যেবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশও বিলম্বিত হয়েছে, তা আমরা জ্ঞাত আছি। তবে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল, তা যে এদেশের মাটি থেকে নয় এবং সামাজিক-আর্থিক কল্যাণদৃষ্টি থেকেও নয়-গবেষকের এ মন্তব্য যথার্থ।

সাহিত্য সম্পর্কে জার্মান সাহিত্যিক শিলারের 'It is literature which can conumand the whole nation"-এ ভাষ্যটি বাংলা সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্যিকের সম্মিলিত জাতি গঠন প্রচেষ্টার সমান্তরালে অগ্রসর হতে পারেনি, ইংরেজদের হিন্দু ও মুসলমানের "divide and rule" নীতির কারণে। শিলারের উপযুক্ত উদ্ধৃতি গবেষক ব্যবহার করলেও তার যৌক্তিক ও বৌদিক ব্যাখ্যা তিনি দান করেননি।

মনুষ্যত্বের উপর সংস্কৃতির ভিত্তি নির্মিত এবং সেজন্য সংস্কৃতির কোন ধর্মগত বা দেশগত রূপ থাকতে পারে না বলে আবুল ফজল যে মন্তব্য করেছেন, সে মন্তব্যকে গবেষকের মতো আমরাও গুরুত্বপূর্ণ

মনে করি। মুসলমানরাও যাতে নিজেকে পাকিস্তানী না ভেবে বাঙালি ভেবে সে বোধের উপর গুরুত্ব প্রদান করে ড. বিশ্বাস উপযুক্ত মন্তব্যে সে বক্তব্যকেই প্রতিপাদিত করেছেন।

গবেষকের গ্রন্থটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৮৫২ থেকে ১৮৭৬ পর্যন্ত লিখিত নাটকের বিষয়কেন্দ্রিক আলোচনা করতে যেয়ে তিনি শ্রী নারায়ণ চট্টরাজ, মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরলাল রায়, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন, মহেন্দ্রনাথ প্রমুখ নাট্যকারের নাটকে মুসলমান সমাজ প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন উপযুক্ত নাট্যকারদের মধ্যে মধুসূদন ও দীনবন্ধু মিত্র ছাড়া অধিকাংশ নাট্যকারদের মানসিকতায় মুসলমান বিরোধিতা অধিক হবার কারণ হিসেবে তারা যুগের বলী হয়েছেন বলে গবেষক মন্তব্য করেছেন।

১৮৭৬ থেকে ১৯০০ সময় পর্বের নাট্যকারদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের নাটকে হিন্দু আদর্শের উদ্বুদ্ধীকরণ থাকলেও মুসলমানকে তিনি সহনীয় দৃষ্টিভঙ্গিতেই চিত্রিত করেছেন। রাজকৃষ্ণ রায় অঙ্কিত মুসলমান চরিত্রও বিকৃত নয়, বরং কাহিনীর বিষয় বাস্তবানুগ। হিন্দুয়ানীতে মনোমোহন বসুর যথেষ্ট ভক্তি ও প্রীতি থাকলেও মুসলমানকে তিনি হীন চরিত্র করে অংকন করেননি।

১৯০১ থেকে ১৯২৩ সময়পর্বে ইংরেজ কর্তৃক হিন্দু-মুসলমান বিভেদনীতি আরো তীব্রতর হতে থাকে। বঙ্গভঙ্গ এবং বঙ্গভঙ্গ রোধ এবং অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে তা প্রতিফলিত। রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট', 'প্রায়শ্চিত্য' প্রভৃতি নাটকে হিন্দু বা মুসলমান নয়, মানুষই বড় হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র চিত্রিত ঈশা খাঁ শুধু সম্মানিত চরিত্র হিসেবেই বিবেচিত হয়নি বরং ধর্মীয় অনুশাসনে এবং কর্তব্যবোধেও তা উজ্জ্বল হিসেবে প্রতিভাসিত। ক্ষীরোদ প্রসাদের নাটকের মুসলিম নাট্যচরিত্রে ইসলাম ধর্মের মর্মগত দর্শনের গভীরে অনুপ্রবেশের প্রচেষ্টা না থাকলেও এবং ক্ষেত্রবিশেষে মুসলমান চরিত্র হীন হিসেবে চিত্রিত হয়েছে মনে হলেও হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্য প্রচেষ্টার অনুধাবনও তাঁর নাটকে প্রতিভাত হয়েছে।

১৯২৩ থেকে ১৯৫০ সময় পর্বের নাট্যকারদের সম্পর্কে গবেষকের মূল্যায়ন প্রণিধানযোগ্য: "মন্থথ রায়, মীর কাশিম যেমন উদার, তেমনি বিজন ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, দিগিন্দ্রচন্দ্র প্রমুখের রচনাতে মিলনের মধ্যেও মুসলমান মহানরূপে স্থান পেয়েছে সামাজিক ঐতিহাসিক চরিত্র হয়েও। তুলসী লাহিড়ী মুসলমানের গভীরে প্রবেশ করে সমাজ বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন, উদার মধুর মানসিকতায়।" (পৃঃ-১৩০)

মুসলমান নাট্যকারদের নাটকে মুসলিম সমাজ অনুধাবন করার ক্ষেত্রে গবেষক ১৮৫২ থেকে ১৯৫০ সময়পর্ব পর্যন্ত মুসলমান নাটক রচয়িতাদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন, কাজী নজরুল ইসলাম, ইব্রাহীম খান, ওবায়েদ-উল-হক, আবুল ফজল, ইব্রাহিম খলিল এবং মুনীর চৌধুরী প্রমুখের কতিপয় নাটকের কথা উল্লেখ করেছেন। নজরুল তাঁর 'পুতুলের বিয়ে' নাটকে হিন্দু ও মুসলমানকে সমান বলেছেন এবং এক ধর্মের লোক অন্য ধর্মের কাউকে ঘৃণা করলে ভগবান অসন্তুষ্ট হন বলে মন্তব্য করেছেন। ওবায়েদ-উল-হক তাঁর নাটকে দেখিয়েছেন, গোঁড়া সমাজ কতটা অমানবিক ও রক্ষণশীল হতে পারে এবং আধুনিকতা মাত্রাহীন হলে স্বাধীনতার নামে তা কিরূপ স্বেচ্ছাচারিতা সৃষ্টি করতে পারে। মুনীর চৌধুরীর 'মানুষ' (১৯৪৭) নাটকে একজন হিন্দুকে একজন পর্দানশীল মুসলমান মাতা কিভাবে সাম্প্রদায়িকতার বীভৎসতা থেকে বাঁচায় সেকথা বলা হয়েছে। এতে অসাম্প্রদায়িক বোধ উচ্চকিত হয়েছে। এ পর্যায়ের মুসলিম নাট্যকারগণ সংস্কারবিমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে আধুনিক মননসিদ্ধতায় জারিত করে মুসলমান চরিত্রগুলোকে শৈল্পিকভাবে বিনির্মাণ করেছেন। ড. বিশ্বাসের গ্রন্থে মুসলমান সমাজের এক ধরনের ধর্মবিধিতাত্ত্বিক সামাজিক রূপের পরিচয় আমরা প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু বাস্তব সমাজ কাঠামো এবং মুসলমানদের যাপিত জীবনের সাথে শরীয়তি ধর্মবিধান সংক্রান্ত ক্লাসিক্যাল

সমাজ বিধানের সম্পর্ক আমরা খুব একটা প্রত্যক্ষ করি না। জনাব ঊষাপতি ভালো করতেন, যদি তিনি নাটকে চিত্রায়িত সমাজের সাথে তদ-এলাকার বাস্ত্মব সমাজচিত্রের সমান্ত্মরাল অনুপ্রবেশ ও মূল্যায়ন ঘটাতেন। মুসলিম নাট্যকারদের মধ্যে মাত্র ৯ জনের আলোচনা না এনে কমপড়্গে ১৫ জনের আলোচনা আনতে পারতেন, যেহেতু হিন্দু সম্প্রদায়ের ৩১ জন নাট্যকারের আলোচনা এনেছেন। অথবা তিনি যেহেতু মোট ৪০ জন নাট্যকারের নাটক আলোচনাভুক্ত করেছেন, সেজন্য ২০ জন হিন্দু এবং ২০ জন মুসলমান নাট্যকারের নাটকও তিনি গবেষণাভুক্ত করতে পারতেন। তাঁর গ্রন্থপঞ্জি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সেখানে মুহাম্মদ মজির উদ্দিন মিয়ার 'বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা' এবং ড. সুকুমার বিশ্বাসের 'বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা' গ্রন্থদ্বয়ের কোন উলেস্নখ নেই। এ দুটো গবেষণাগ্রন্থ ব্যবহার করলে মুসলমান সমাজ সম্পর্কে তাঁর বিশেস্নষণ ও মূল্যায়ন আরো গভীরতর হতে পারতো বলে আমি মনে করি। তবে তিনি যে শতাধিক মূল নাটক ঘেঁটে মুসলমান সমাজের চিত্র পাঠকদের উপহার দিয়েছেন, সে পরিশ্রমসাধ্য কাজের জন্য তিনি অবশ্যই ধন্যবাদ পাবার যোগ্য।

কর্ণফুলীর বিশেষ প্রতিবেদন